নদীমাতৃক সুন্দরবন

ড. সুভাষ মিস্ত্রী

"নদী কত কথা বলে তীরের কানে কানে"

এক

জল-জঙ্গল-জীব সমাহারে 'সুন্দরবন।' নদীমাতৃকতাই সুন্দরবনের মৌল। মূলত গাঙ্গেয় ডেল্‌টা বা গাঙ্গেয় বদ্বীপ। গঙ্গার উৎপত্তিস্থল দেবাত্মা হিমালয়। হিমালয় পর্বতমালার গোমুখে বরফগলা জলরাশি হিমালয়-ছোটনাগপুর-গারো রাজমহলের মধ্য দিয়ে গভীর সমুদ্রাভিমুখী প্রবাহ রয়েছে অব্যাহত। প্রায় তিন বিলিয়ন তুষারমৌল বাহিত গঙ্গা হিমালয়ের খাড়াই ভূখণ্ড থেকে নিম্নমুখী ব্রহ্মপুত্র-ভৈরব-পদ্মা হয়ে ক্রমশ বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ত জলের সংস্পর্শে এসে গঙ্গারই শাখানদী পদ্মা-ভাগিরথীর মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে ত্রিভূজাকৃতি পল্ললময় ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে।

তুষারশৈল হিমালয় পর্বতমালাই সামুদ্রিক নদীর উৎস। যাব হিমালয়, তাব গঙ্গা ও তার উপনদীসমূহ ও বদ্বীপাঞ্চল। উৎসমূল থেকে খরকল্লোলিত ধারা তীব্রবেগে ছুটতে থাকায় নদীবক্ষে তখন পাললিক মৌল জমতে পারে না। সমভূমিতে প্রবাহ মন্থর হয়ে পড়ে। নদী চওড়া হয়ে বৃহদাকার ধারণ করে। সমুদ্রের লবণাক্ত জলের সংস্পর্শে বাহিত জমাপলির প্রতিবন্ধকতায় নদী প্রবাহিত হয় বিভিন্ন পথে। সৃষ্টি হয় বদ্বীপ. অবশ্য, স্বাদুজলপ্রবাহের পরিমাণ, সামুদ্রিক নদী ও বৃহৎ নদীর ক্ষীণপ্রবাহ, নদী বক্ষের ঢাল, বিপুল পলি প্রবাহ প্রভৃতি তারতম্যানুসারে সমুদ্র মোহনায় পলি জমা, বদ্বীপ সৃষ্টি ও নদী-খাড়ী গঠনেরও অন্যতম কারণ। মানবদেহের শিরা-উপশিরার মতো ইতস্তত ছড়ানো সুন্দরবনের নদ-নদীগুলির অধিকাংশেরই এভাবে সৃষ্টি। (River)-র পরিভাষায় বাংলায় পুংলিঙ্গ অর্থে "নদ" — দামোদর "নদ", রূপনারায়ণ 'নদ' ইত্যাদি এবং স্ত্রীলিঙ্গ অর্থে 'নদী'। সুন্দরবনের প্রধান নদী সমূহ স্ত্রীলিঙ্গ অর্থে নদী।

চব্বিশ পরগনা ৮৮° - ৮৯° পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ২১°৩০′ - ২৩° ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত ও এর একতৃতীয়াংশ সুন্দরবন। সমগ্র ভূভাগ ক্রমশ ঢালু হয়ে সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে। প্রবাহিত নদীর বালি-কাদা ও পলি মিলে স্থল-মৃত্তিকা। উত্তরাংশে মাটি মিহিবালি বা বেলে-দোঁয়াশলা। দক্ষিণাংশের মাটি এঁটেল যুক্ত দো-আঁশলা। সমুদ্রের সঙ্গে নদীগুলির সংযোগ নির্ভর হওয়ায় সুন্দরবনের মাটি লবণাক্ত ও এঁটেল-দোআঁশলা।

তবে বালির পরিমাণ বেশী। বঙ্গোপসাগর সন্নিহিত হওয়ায় সুন্দরবনে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ুর প্রভাবে প্রচুর পরিমাণ ঝড়বৃষ্টি হয়। নিম্নচাপ এবং জলস্ফীতিও। মাঝেমাঝে 'সুনামি'র মতো 'আয়লা' আসে। জনপদভূমি বিধ্বস্ত করে দিয়ে যায়। জলবায়ু উষ্ণ আর্দ্র ও গুমোট এবং সমুদ্র সান্নিধ্য ও নদীর জোয়ার-ভাটার প্রভাবে বাতাসে নোনা জলীয়বাষ্প থাকে বেশি। মার্চ থেকে জুন গ্রীষ্মকাল — তাপমাত্রা ৩৬° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর বর্ষাকাল। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮০"। শীতের তাপমাত্রা ১৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

হল্যাণ্ড-নেদারল্যাণ্ডের মতো সুন্দরবনও সমুদ্র সম্ভূত। যদিও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০ মিটার উচ্চে অবস্থান। উদ্ভিদ উপযোগী চরভূমি সৃষ্টি ও গঠনের প্রাথমিক পর্যায় পর্যবেক্ষণে সুন্দরবনের আদি আত্মার পরিচয় খানিকটা মিললেও সুন্দরবন ভাঙা গড়ার অমোঘ প্রকৃতির অস্থির অবস্থানের চিরস্মারক। ভাঙতে ভাঙতে গড়ার বন্ধনে সুন্দরবন পৃথিবীর বিস্ময় ও সর্ববৃহৎ বদ্বীপ অঞ্চল। এখানেই অবস্থিতি ভুবন বিখ্যাত 'ম্যানগ্রোভ' বা লবণাম্বু উদ্ভিদের বনভূমি। ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ ঝড়ে বা জোয়ার-ভাটার তোড়ে উপড়ে যায় না। নরম কাদায় দিব্যি হয়। ভূমিক্ষয়রোধ ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। চারিত্রিক অবস্থানানুসারে শহর ও গঞ্জ সংলগ্ন পরিণত দ্বীপ, নিবিড় আবাদ উত্তর দ্বীপ, গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলও সমুদ্র সংশ্লিষ্ট বদ্বীপ, চরভূমি ও সংরক্ষিত বনভূমি বা 'অভয় অরণ্য।'

দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে সুন্দরবন অববাহিকা ভূপৃষ্ঠের অবনমনে ধীরে ধীরে পূর্ব দিক কাত্ হোয়ে যাওয়ায় ভাগীরথী-হুগলীর স্বাদুজল কমে গেছে। সমস্ত নদীগুলিতে সমুদ্রেরই জোয়ার-ভাটার জল ওঠানামা করে চব্বিশ ঘণ্টায় দু'বার করে। তবে সমুদ্রে জোয়ার শুরু হয় আগে। জোয়ার নির্ভর করে চন্দ্রের অবস্থান বা তিথির উপর। সমুদ্র সন্নিহিত নদীগুলির জোয়ার প্রবাহ উঠতে উঠতে বিশেষ অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছায়। আবার ভাটাতে সেই জল বেরিয়ে যেতে-না-যেতেই জোয়ার লাগে। গোসাবা, সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, বাসন্তী, কুলতলি, পাথর প্রতিমা, ক্যানিং, কাকদ্বীপ, ভাঙড়, হাড়োয়া প্রভৃতি ব্লক বা থানা এলাকার নদীগুলির জল নিদারুণ নোনা। নদী জলের লবণাক্ততা তীব্রতর হয় শীতকালে। নদীর নোনা জল ও মাটিতে থাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। এই সমূহ অঞ্চলে পানীয় জলের হদিস ৮০০' থেকে ১৫০০' ফুট মাটির নিচে মিললেও মিলতে পারে।

হাজার হাজার বছর ধরে পলি জমে গড়ে উঠেছে যে ভূ-অঞ্চল তার পরিণত ভূভাগে গড়ে উঠেছে কলকাতা, ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলা। জনপদ ভূমি গঠনের তালে তাল মিলিয়ে ভূপ্রকৃতিও দক্ষিণে এবং সমুদ্রও পিছনে সরে যাচ্ছে। গড়ে উঠছে 'পূর্বাশা' প্রভৃতি দ্বীপ। প্রকৃতির অতলগর্ভ ও অবনমন, ভূকম্পন, ঘূর্ণাবর্ত প্রভৃতি সঙ্গে করে চলতে চলতে নদীর যে দু'হাজার বছরের আগের মোহনা, বর্তমান মোহনা থেকে ২০০ মাইল

ভিতরে ১৪৪° অক্ষাংশের মধ্যে ছিল তা আরোও পিছিয়ে গেছে, যাচ্ছেও। অর্থাৎ সমুদ্র কতটা স্থলভাগ গ্রাম করে চলেছে অথবা ভূভাগ কতটা সমুদ্রের দিকে হাত বাড়িয়ে চলেছে তা সহজেই অনুমেয়। পূর্বভারতের জলবায়ুই পরিবর্তিত হয়ে গেছে, যাচ্ছেও। হিমালয় বাহিত পাললিক মাটি সুন্দরবনকে স্থায়ী গঠনতন্ত্রের রূপ দিতে পারে নি। কারণ, যে হিমালয় গঙ্গার সৃষ্টি সেই হিমালয়েরই কিছু অংশ পাললিক শিলায় গঠিত। যা সহজেই ক্ষয় হয় ও প্রায়শ শিলাবিচ্যুতি ঘটায়। ফলে ভূগঠন অব্যাহত। উৎস থেকে শুরু করে হুগলি বরাবর মোহনা পর্যন্ত গঙ্গার ২,৫৩৯ কিলোমিটারের ৫২৪ কিলোমিটার পশ্চিমবঙ্গে।

সাবেক ২৪ পরগনার ১৯টি উন্নয়শীল ব্লকে ৩৫ লক্ষাধিক মানুষের বসবাস নদীমাতৃক সুন্দরবনে। অধিকাংশই বা ১৫ লক্ষাধিক তফসিলী জাতি ও ২ লক্ষাধিক তফসিলী উপজাতি বা নিম্নবর্গীয় সহ মুসলিম-ব্রাহ্মণ-খ্রিস্টান ও অন্যান্য শ্রেণী-বৃত্তি-সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন। 'বদর' অর্থাৎ 'সমুদ্র'। আর সমুদ্র সন্নিহিত বনই সুন্দরবন অর্থে 'বদরবন' বা 'বাদাবন'। লোকালয় ও বাদাবন মিলিয়ে আয়তন ৪৪৬৫৩৭ হেক্টর বা ৯৬৩০ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ৫৩৬৬ বর্গকিলোমিটার বর্তমান লোকালয়-কৃষিক্ষেত্র ও মাছের ভেড়ি। নদ-নদী ও নদীর চড়া ১৯৬৭ বর্গকিলোমিটার। ১০২টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪টি দ্বীপ ঘিরে সুন্দরবনের বসতি অঞ্চলে বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধন সহ বন্যাপ্রতিরোধ ও সেচের উদ্দেশ্যে শ্বেত ও কৃষ্ণজমিদারেরা নিজেদের আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী ৩৫০০ কিলোমিটার নদীবাঁধ নির্মাণ করে প্রায় ১৫০ বছর ধরে। বাঁধের মাটি নদীর ভিতরকার চর কেটে-কেটে নেওয়ায় বাঁধগুলি দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু। বাঁধের কোল ঘেঁসে মাটি কেটে বাঁধ দিলেও গর্ত বা 'অল্'গুলি পরপর জোয়ারের সঙ্গে আসা পলিমাটিতে ভরাট হয়ে যায়। জমির লেভেল নদীর জোয়ারের লেভেল অপেক্ষা নিচু থাকায় বাঁধগুলি দ্বীপমধ্যস্থ জমি অপেক্ষা ৩—১২ ফুট উপরে থাকে। যেকোনো মুহূর্তে, যেকোনও কারণে নদী বাঁধ ভেঙে গেলে অকালবন্যা স্বাভাবিক ঘটনা।

ভারতের প্রধান ১৪টি নদনদীর মধ্যে মাত্র ৩টি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও সুবর্ণরেখার উপনদী ও শাখানদীসমূহ পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদী। দক্ষিণবঙ্গের নিম্নভূমি গাঙ্গেয় বদ্বীপ হলেও শিরা-উপশিরা সদৃশ অসংখ্য ছোট-বড়, চওড়া-সরু, নদ-নদী, খাড়ি-নালা-সুতী সমান্তরালভাবে সমুদ্রাভিমুখী। নদীগুলির প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে সংযুক্ত। সহজেই এক নদী থেকে অন্য নদীতে যাওয়া-আসা করা যায়। সমুদ্র জোয়ার জল পুষ্ট নদীগুলিতে বর্ষায় দুই বিপরীতমুখী স্রোতপ্রবাহ দেখা যায়। সমুদ্রের স্রোত প্রবাহিত হয় দক্ষিণ থেকে উত্তরে। কিন্তু, বর্ষার জলধারা প্রবাহিত হয় উত্তর থেকে দক্ষিণে। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ৪৫ থেক ৬৫ কি.মি. বাতাসের গতিবেগ থাকায় জলও ফুলে ও ফেঁপে ওঠে। দুর্বল নদীবাঁধ ধ্বসে যায়। অমাবস্যা-পূর্ণিমাতে ন্যূনতম ১০ দিন জলের প্রবাহ মাত্রা বেশি থাকে। এ সময় ঝড়-বন্যা-সামুদ্রিক উচ্ছ্বাস নিম্নচাপ থাকলে নদীগুলি ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। জনপদ লবণাক্ত

জলে প্লাবিত হয়। জীববৈচিত্রে নেমে আসে বিপর্যয়। নোনা প্লাবিত অঞ্চল মানুষ ও প্রকৃতির সহযোগে স্বাভাবিক হতে ৩—৬ বছর লাগেই।

জোয়ার-ভাটার গতিবেগের উপর সুন্দরবনের নদীর বাঁচা-মরা। জোয়ারের তুলনায় ভাটার স্থায়িত্ব বেশি। স্রোতের বেগও কম। ফলে জোয়ারে ভেসে আসা পলি জমতে থাকে। নদীও ঘুরে ফিরে মোহনায় মিলন অভিসারের পথ খোঁজে। কখনো পথ পায়, কখনোবা পায় না। হারিয়ে যায় জমা মাটির জমিনে। এই জোয়ার ভাটার পর্যায় ক্রমে নদীর অবস্থান নির্ণীত হয়। জুলাই-অক্টোবর বর্ষাকাল। জোয়ারে নদীর জল সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত ওঠে। কিন্তু, ভাটার জল সর্বনিম্ন সীমায় নামে না। নভেম্বর—ফেব্রুয়ারি শীতকাল। জোয়ারের জল সর্বোচ্চ সীমায় ওঠে না। কিন্তু, ভাটার জল সর্বনিম্ন সীমায় নেমে যায়। মার্চ—জুন গ্রীষ্মকাল। জোয়ারের জল অমাবস্যা-পূর্ণিমা ব্যতিরিক্ত সর্বোচ্চ সীমার নিচে থাকেও ভাটার জল সর্বনিম্ন সীমায় নেমে যায়। সমূহ এই নোনা নদীর জোয়ার-ভাটা খেলা দ্বীপ অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ প্রজাতির উদ্ভিদ, জীববৈচিত্র, মৃত্তিকা, জলবায়ু সমাহারে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র। আর উদ্ভিদমাত্র একেলা বাঁচে না। স্থলজ-জলজ-উভচর-খেচর প্রাণীদেরও বাঁচতে সহায়তা করে। ৬৪ প্রজাতীয় ম্যানগ্রোভ ও অসংখ্য বৃক্ষগুল্ম সহ বনও খাড়িতে ১৫৮৬ প্রজাতীর প্রাণী লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত। ২০০ থেকে ২৫০ প্রজাতির পাখি, ৭০ প্রজাতির কাঁকড়া-শামুক-ঝিনুক, ১৩০ প্রজাতির মাছ ইত্যাদি জীব-প্রাণীর আদর্শ বাসস্থান ও বিচরণভূমি সুন্দরবন।

বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা লবণ জলে দিনে দু'বার ডুবে যাওয়া ও তৎসহ পলি জমার ফলে মাছ বা বিভিন্ন জলজ ও স্থলজ প্রাণী আশ্রয় ও বিচরণের সুযোগ পায়। বায়বীয়স্থল বা শিকড় বনভূমিকে শক্তপোক্তভাবে ধরে রাখে। গাছের পরিণত পাতা জমে জমে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, জৈবপদার্থের সৃষ্টি করে এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রজাতির খাদ্য হিসাবে জল ও মাটিতে জৈব পদার্থের জোগান দেয়। তাই ম্যানগ্রোভ প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিহত, মাটির ক্ষয়রোধ ও নদীবক্ষে পলি জমারোধ ও প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখে। নদীমাতৃক জৈব-অজৈব সমাহারে যে পরিবেশ, জীব ও জড় সমন্বয়ে যে প্রকৃতি সেই জীবও মানুষ একে অপরের পরিপূরক বা আজীবন-আমৃত্যু পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ।

দুই.

রাজমহলের উত্তর-পশ্চিম গঙ্গাতীর ঘেঁষে তেলিগড় ও ক্রিটিগলির গিরিবর্ত্ম অতিক্রমণে সমতল বাংলার দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ-কাশিম বাজারের মধ্যে তিন দক্ষিণবাহিনী শাখার জল প্রবাহ কাশিমবারের উত্তর থেকে একত্র বাহিত হয়ে সোজা দক্ষিণমুখী গঙ্গা সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়েছে। তিনটি স্বতন্ত্র শাখা গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথী। মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজার-জঙ্গীপুর পর্যন্ত নদী গঙ্গা। অপর দুই শাখা ভাগীরথী ও পদ্মা। গঙ্গার অপর নাম ভাগীরথী হবার প্রেক্ষাপট পুরাণবর্ণিত সগরবংশীয় রাজা ভগীরথ ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে

গঙ্গাপ্রবাহকে সাগরে প্রবাহিত করেন এবং জাহ্নবী জহ্নুমুনি সংশ্লিষ্ট। স্বর্গ থেকে পতনের সময় গঙ্গাকে জটাজুটধারী মহাদেব মাথায় ধারণ করেন। 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' জগদীশ চন্দ্র বসু লিখেছেন 'নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' 'মহাদেবের জটা হতে'। পুরাণবর্ণিত কাহিনীর নির্যাস — আসলে সেচ ব্যবস্থা ও যোগাযোগের সুবিধার্থে খাল কেটে প্রবাহকে মুক্ত করা হয়।

ভূবিজ্ঞানীদের মতে গঙ্গা প্রবাহিত হবার পূর্ব থেকেই সুন্দরবন-বদ্বীপের অস্তিত্ব ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম-ক্যানিং-চৌখালি বোরিং-র সময় যে হলুদ কাদা ও বালির সন্ধান মিলেছে তা গঙ্গাবাহিত পলির ভূস্তরের থেকে ভিন্ন। কলকাতার ১৫০০০ ফুট নিচের চুনাস্তরও ভাগীরথী-হুগলী নদী বাহিত পলিস্তর নয়। কুষাণ পূর্ব থেকে সেনযুগ বা আদি-মধ্য-নব্য প্রস্তর যুগের অন্য কোনও নদীর দ্বারা গঠিত বদ্বীপ। ভূপৃষ্ঠের অবনমন, ভূমিকম্প, অতলগর্ভ ঘূর্ণাবর্ত, প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক লীলাবর্তে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। প্রত্নইতিহাসের প্রেক্ষিতে পুনঃসৃষ্টির অমোঘ প্রক্রিয়ায় উত্থান ঘটে সুন্দরবনের। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যেই আদি গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল জুড়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গড়ে ওঠে এক সুসংহত সভ্যতা। 'মণ্ডলিকা' কখনওবা 'গঙ্গারিডি' সভ্যতা প্রভৃতি নামে পরিচিতি পায়। কিন্তু এর অধিকাংশই সুনামী জাতীয় নৈসর্গিক প্রক্রিয়ায় জলমগ্ন হয়। পুনরায় ছয়-সাত হাজার বছর ধরে নদী-সমুদ্র-ভূমিভাগের লীলা খেলায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জনশূন্য এলাকা মাথা তুলে দাঁড়ায়। গঙ্গাবাহিত পলি ভূখণ্ডে জনবসতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সহায়ক করেছে ও ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী হয়ে কোমল নরম ও নমনীয় নবসৃষ্ট ভূমি (New Alluvium) বা নিম্ন-ভূভাগ গঠন করে চলেছে। এই জলপ্রবাহ যেমন ভূমিগঠনে তৎপর তেমনি আবার শস্য ফলায় এবং ভূমি ভেঙে কখনও-কখনও অভিশাপ হয়ে ওঠে।

মৎসপুরাণ অনুযায়ী হিমালয় আত্মজা গঙ্গার পূর্বদক্ষিণমুখী সাতটি প্রবাহের মধ্যবর্তী ভাগীরথী কুরু, ভরত, পঞ্চাল, কৌশিক ও মগধ অতিক্রম করে রাজমহল পর্বতমালায় প্রতিহত হয়ে রাঢ়-বঙ্গ-সুক্ষ্ম দেশে প্রবাহিত ছিল। সপ্তদশ শতকে দমোদরের দুটি প্রবাহের একটি উত্তর পূর্বমুখী হয়ে নদীয়া-নিমতার দক্ষিণে গঙ্গায় মিশেছে এবং অপরটি তমলুকের পাশ দিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। বর্ধমানের দক্ষিণে দামোদরের সঙ্গে সরস্বতীর সংযোগ। অষ্টম শতক থেকে সরস্বতী-ভাগীরথীর প্রবাহ শুকিয়ে যেতে থাকলে সুক্ষ বা তাম্রলিপ্ত বন্দরের বিনষ্টি ঘটে, সমৃদ্ধি ঘটে হুগলির।

রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত পুরাণাদি ও বিদেশী পর্যটকদের নক্সা অবলম্বনে ভূবিজ্ঞানীগণ একমত — আদিতে সুন্দরবনে অসংখ্য নদী-নালা ছিল। মহাভারতে সাগরসঙ্গমে পাঁচশতনদী এবং রামায়ণ ও ভাগবতে শতমুখী গঙ্গা উল্লিখিত। যদিও মনসামঙ্গলে সাগরসঙ্গমের কাছে গঙ্গার চার মুখ। চাঁদসাগরের বাণিজ্যতরী, রামেশ্বর পার হয়ে সাগরসঙ্গমের অভিমুখে যাত্রা পথে পড়েছে-অজয়, উজানী, শিয়ালনালা,

কাটোয়া, ইন্দ্রানী, নদীয়া, ফুলিয়া, গুপ্তিপাড়া, মিজাপুর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, ডানদিকে হুগলি, বামদিকে ভাটপাড়া, পশ্চিমে বোরো, পূর্বে কাকিশড়া, মুলাজোড়, গুড়ালিয়া, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, ডানদিকে চাঁপাদানি, বামদিকে ইছাপুর, নিমাইতীর্থ, মহেশ, খড়দহ, রিষড়া, কোন্নগর, আড়িয়াদহ, চিৎপুর, কলকাতা, বেতড়, কালীঘাট, বারুইপুর, ছত্রভোগ, বদরিকাকুণ্ড, হাতিয়াগড়, চৌমুখী, শতমুখী এবং পরিশেষে সাগরসঙ্গমতীর্থ। অর্থাৎ কলকাতা পর্যন্ত পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বর্তমান ভাগীরথীই ছিল প্রধানতম প্রবাহ। ত্রিবেণী বা মুক্তবেণীতে সরস্বতী-ভাগীরথী-যমুনা সঙ্গম এবং কলকাতা ও বেতড়ের দক্ষিণে বর্তমান আদিগঙ্গার খাতেই ভাগীরথীর সমুদ্রযাত্রা। কিন্তু, দুর্গম ও অরণ্য অধ্যুষিত এই নদীগুলির অনেকটাই আদিগঙ্গার মতো অবস্থাপ্রাপ্তি হয়েছে। অনেকের নাম গেছে হারিয়ে। কোনও কোনও নদী থেকে গেছে অজ্ঞাত। গঙ্গা বা ভাগীরথীর নাম উজ্জ্বল হয়ে থেকে গেছে। কলকাতার পাশ দিয়ে সুন্দরবনের উত্তরাংশে প্রবাহিত মজাগঙ্গা বা আদিগঙ্গা সন্নিহিত জনপদগুলি কালীঘাট, বৈষ্ণবঘাটা, বোড়াল, রাজপুর, মহীনগর, বারুইপুর, নাচনগঙ্গা, কুলটি, দক্ষিণবারাসাত, জয়নগর, মজিলপুর ইত্যাদি বর্তমান। কালীঘাট, খাড়িগ্রাম, ছত্রভোগ পেরিয়ে গঙ্গা বা ভাগীরথীর মহাগর্ভ গোবদিয়া, কাকদ্বীপের উপর দিয়ে সাগরদ্বীপ, ধবলঘাট, মনসাদ্বীপের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে।

দ্বাদশ শতকের পূর্বে ভাগীরথী-হুগলির পথে প্রবাহিত গঙ্গার তীরে গড়ে উঠেছিল তাম্রলিপ্ত, সাতগাঁও, সোনারগাঁও। কম্বোডিয়া, বার্মা, সিংহল, পারস্যে ব্যবসা হতো সমূহ বন্দর দিয়ে। দশম থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের সাথে সাথে কলকাতা সহ দক্ষিণ বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল পলি জমে মনুষ্যবসতি গড়ে ওঠে। কৃষিকার্য সম্পাদিত হতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য-সেচ ব্যবস্থা, জনবসতি নির্মাণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় আবশ্যিকতায় নদীর গতিপথে হস্তক্ষেপ করে মানুষ। ১৭৫০ সালে আদিগঙ্গার ধারাপথকে আউটরামঘাট-গার্ডেনরিচের নিকটবর্তী হাওড়ার ব্যাঁটরামুখি খাল কেটে সরস্বতীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৭৭৫ সালে কর্ণেল টলি ফোর্টউইলিয়াম দুর্গ-কালিঘাটের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নালা বা গোবিন্দপুর ক্রীক খনন করেন যা টালিনালা নামে পরিচিত। মাথা ভাঙ্গাকে চূর্ণী নদীর মাধ্যমে হুগলির সঙ্গে যুক্ত করার জন্য ৫টি খাল খনন হয় ১৮৬০-৬১ সালের মধ্যে। ১৮৫৯ সালে চিৎপুর খাল ; ১৮৯৫ সালে ধাপা, বামনঘাটা-কুলটি ; ১৯১০ সালে কৃষ্ণপুর খাল কাটা হয় অনুরূপভাবে। বজবজ, বিষ্ণুপুর, কুলপি, ডায়মণ্ডহারবার, ফলতা, বারুইপুর, মগরাহাট প্রভৃতি অঞ্চলে বহু খাল খনন করা হয়েছে। মানুষের হস্তক্ষেপে কৃত্রিম প্রবাহ সংযুক্তিকরণে সাময়িক প্রয়োজন মিটলেও বিদ্যাধরী ও মাতলার মতো পিয়ালি, যমুনা, কালিন্দী, ইছামতীর নদীগর্ভে পলি জমে জমে নদী প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিপথের মৃত্যু আসন্ন হয়ে ওঠে।

তিন.

দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সমাকীর্ণ সুন্দরবনের অসংখ্য নদীনালা সমান্তরালভাবে দক্ষিণে প্রবাহিত। কিন্তু, সরাসরি গঙ্গার প্রভাব নেই এই নদীগুলিতে। নদীবিজ্ঞানীগণ বলছেন — গঙ্গা সুন্দরবনের পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত। সুন্দরবনে প্রধান নদীগুলি ভাগীরথী, হুগলি, ইছামতী, মুড়িগঙ্গা, মাতলা, গোসাবা, রায়মঙ্গল, হাড়োয়া, হেড়োভাঙ্গা, কুলটি, কালিন্দী, সপ্তমুখী, ঠাকুরাণ, বিদ্যা, কলগাছিয়া, বিদ্যাধরী, গোমর, কর্তাল, জগদ্দল, হোগল, চূর্ণী, মনি, হাতানিয়া-দোয়ানিয়া প্রভৃতি। সঙ্গে আছে অসংখ্য শাখা নদী, উপনদী, খাল বা প্রণালী। নদীগুলি সমুদ্রোপকূল সংলগ্ন হলেও তীব্রবেগবান নয়। আবার একমুখিও নয়। নানা দিকে বিস্তৃত। সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত দ্বীপগুলিও নদীবেষ্টিত। সমুদ্র সংযোগের কারণে নদীর জল ও সমুদ্রের নোনা জলের সংশ্লেষ ঘটে। আর এই নদী-স্রোত সংলগ্নতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল সুন্দরবনের আর্থ-ভৌগোলিক গঠন।

গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলি

অনাদি অনন্তকাল ধরে ভারতের বুকে পবিত্র জলধারা হয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গানদী। ২৫৩৯ কিলোমিটার দীর্ঘ গঙ্গার অববাহিকার উত্তরে হিমালয়। দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত। আর শেষাংশ পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে ৫২৪ কিলোমিটার। গঙ্গাবাহিত পলি গঠিত বদ্বীপের সমষ্টি সুন্দরবন। উত্তর থেকে ধেয়ে আসা মিষ্টি জলপ্রবাহ, সাগরের জোয়ার-ভাটার জলপ্রবাহের নৈমিত্তিক ঋ তুকালীন পরিবর্তনে সুন্দরবনও নিয়ত ভাঙ্গা-গড়ার লীলাচপলতায় ঋ দ্ধ। ভারত-বাংলাদেশ একত্রে সুন্দরবনের দশ হাজার বর্গকিলোমিটারের মধ্যে তিন হাজার চারশো বর্গকিলোমিটারই জলা এলাকা।

গঙ্গার অপর নাম ভাগীরথী এবং হুগলী নদী গঙ্গারই প্রবাহ। গঙ্গা বা ভাগীরথী তার গর্ভোত্থিত পলির বাধা পেয়ে অপেক্ষাকৃত নিচু জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে একটি ধারা হুগলি নদী নামে সাগরের দিকে ধাবিত এবং অপর ধারাটি পদ্মানামে পরিচিত। অর্থাৎ, উত্তর গাড়োয়ালের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎসারিত হয়ে গঙ্গা ২৫০ কি.মি. গিরিপথ বেয়ে সমভূমিতে নেমে এসেছে হৃষিকেশের কাছে। হৃষিকেশের ৩০ কি.মি. উত্তরে হরিদ্বার। হরিদ্বারের ৭৭০ কি.মি. দূরত্বে প্রয়াগ এবং প্রয়াগ থেকে ২৪৫ কি.মি. নিচে বারাণসী। এরপর আরোও ১৪৫ কি.মি. পথ অতিক্রম করে গঙ্গা বিহার-রাজমহল অতিক্রম করে ১০০ কি.মি. নিচে ধুলিয়ানের কাছে গেরিয়ায় দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। গঙ্গার দ্বিধাবিভক্তির একটি ধারা পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবাহিত এবং অন্যটি পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী। এই ভাগীরথীই কালনার পর থেকে আরোও দক্ষিণাংশে জোয়ার-ভাটা খেলা অংশেরই নাম হুগলি।

জোয়ার জলের নদী হুগলি গঙ্গার জল নিয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করে এবং সমুদ্র-জোয়ারের জল নিয়ে উপরে উঠে আসে। সাগরসঙ্গমে হুগলি নদীমুখ চওড়া ১৬ মাইল। মোহনা

থেকে ৪০ মাইল উপরে দুটি ধারায় বিভক্ত। মূলধারাটি ঘোড়ামারা দ্বীপ ও সাগরদ্বীপের পশ্চিম পাশ দিয়ে সাগরে মিশেছে। অপর ধারাটি ক্রমশ দক্ষিণের দিকে কাকদ্বীপ, নামখানা, মৌসুনি, বকখালি দ্বীপমালায় সমৃদ্ধ। এই ধারাই মৃত গঙ্গা বা আদি ভাগীরথী। একদা সাগরদ্বীপের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে সাগরে মিলিত হতো। এই মিলনস্থলেই কপিলমুনির আশ্রম। আদি ভাগীরথীর সর্বদক্ষিণে নদীপ্রণালী বা ক্রীক-চ্যানেল। কথিত, এই প্রণালী দিয়েই চৈতন্যদেব নৌকাযোগে পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হুগলির মূলধারা সঙ্গম থেকে ৪০ মাইল উপরে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একটি সাগর অভিমুখী ও অপরটি মরা গঙ্গায় পরিণতি পেয়েছে, ঠিক তার মধ্যবর্তী অংশে জেগে উঠেছে বিশাল চর ও দ্বীপ দক্ষিণে নয়াচর, খাসিমারা, ঘোড়ামারা, লোহাচাড়া, রেড-ফোর্ড ও সাগরদ্বীপ। কিছুটা উত্তরে নিম্ন বালারি ও উপরবালারি এবং আরোও উত্তরে ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি নদীগর্ভস্থিত বিশালাকৃতির চরদ্বীপ।

মুড়ি গঙ্গা বা বড়তলা

মুড়ি গঙ্গা আদতে আদি ভাগীরথী। পুরাণ বর্ণিত ভগীরথের মর্তে নিয়ে আসা গঙ্গা। সাগরদ্বীপের পূর্বে বড়তলা বা মুড়িগঙ্গা আর পশ্চিমে ভাগীরথী। হুগলি নদীরই শাখা বড়তলা বা মুড়িগঙ্গা। বেরিয়েছে কাকদ্বীপের কাছে। মোহনার কাছে অবস্থিতির জন্য দৈর্ঘ্যের অনুপাতে প্রস্থ অনেক বেশি।

সপ্তমুখী

সুলতানপুরের কাছে উৎপত্তি। মুড়িগঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়ে হুগলি নদীর শাখা ঘুঘুডাঙ্গা গাঙ বা হাতানিয়া-দোয়ানিয়া ও দেবগ্রাম খালের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে। মুড়িগঙ্গাব পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত সপ্তমুখীর মাঝখানে রয়েছে নামখানা, বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, ফ্রেডরিক হেনরি ও লোথিয়ান দ্বীপ। তমলুক, শুষনি, মালা, চুনপিঁড়ি, দক্ষিণসহ আরোও দুটি মুখের কারণেই 'সপ্তমুখী' নাম। দক্ষিণে লোথিয়ান দ্বীপকে মাঝে রেখে ডানদিকে উত্তর ও দক্ষিণ চন্দনপিঁড়ি, হরিপুর, মহারাজগঞ্জ, দেবনিবাস এবং বামদিকে ব্রজবল্লভপুর ও গোবিন্দপুর আবাদকে ফেলে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে।

ঠাকুরান বা জামিরা

মথুরাপুর-জয়নগর এলাকায় উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রে পড়ার পূর্বে নিম্নভূমিতে ঠাকুরান নদীর নাম ছিল জামিরা। জামিরা সপ্তমুখী নদীর সঙ্গে বিভিন্ন শাখানদীর মাধ্যমে যুক্ত। সপ্তমুখীর পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত জামিরাও সপ্তমুখীর মোহনায় ১৩টি দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে পাথরপ্রতিমা অঞ্চল।

মাতলা

সুন্দরবনের দৃষ্টিনন্দন ও বর্ষায় দুর্দান্ত মাতলা নদীর মুখ আলিপুর ও বসিরহাট মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। ক্যানিং-র কাছে বিদ্যাধরী, করতোয়া, আঠারো বাঁকী, রামপুরা খাল মিলে

মাতলার উৎপত্তি। বিদ্যাধরীর নিম্নাংশ মাতলা কখনও সরু, কখনও প্রশস্ত, আবার কখনওবা বিশাল আকার নিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। মত্ততা থেকে 'মাতলা' নামটি এসেছে। বিদ্যাধরী-করতোয়া-আঠারো বাঁকির মিলিত জলস্রোতের ভয়ঙ্কর ভয়াল রূপ ও গতিবেগের থেকেই এই জোয়ারের নদীর নামের উৎস। বর্ষায় মত্ত থাকলেও শীতে শীর্ণকায়া। নিঃশব্দে হয়ে থাকে ক্যানিং ঘেঁসে। ক্যানিংকে একসময় 'মাতলা গ্রাম' বলা হত। ইংরেজ আমলে ক্যানিং পোর্ট হতে পারেনি বা করা হয়নি। বহু শাখা-প্রশাখার সঙ্গে যুক্ত মাতলা নদী কলকাতা ও পূর্বের জেলাগুলিকে জলপথে যুক্ত রেখে কলকাতা শহর পত্তনের সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। পিয়ালী-বিদ্যাধরী দিয়ে কলকাতার জল নিকাশী হত মাতলার মাধ্যমে। ঝড়-ঝঞ্ঝা-জলোচ্ছ্বাসে মত্ত মাতলা বাঁধ ভাঙে, গ্রাম ভাসায়। কিন্তু, বর্তমানে অবহেলায় চরে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। মাতলার বুকের উপর দিয়ে তৈরি হয়েছে রেল ও সড়কপথ। মাতলার শাখা জয়নগর যাশ এলাকায় কৈকালমারী নামে পরিচিত। কৈকালমারী হাসনাবাদ যাশ ঘুরে মাতলায় যুক্ত হয়েছে।

রায়মঙ্গল

রায়মঙ্গল নদী এসেছে লাট নং ১০৭ ও লাট নং ১০৮-র সন্ধিস্থল সাহেবখালির জলাভূমি থেকে যমুনা নদীরই একটি শাখা হয়ে। জোয়ার-ভাটা খেলা এই নদীর এক এক জায়গায় এক এক নাম — ইছামতী, কালিন্দী, রায়মঙ্গল। তেওড়াবাঁকি ও হরিণডাঙ্গা নদীর মাধ্যমে রায়মঙ্গলের সঙ্গে গোসাবা নদীর সংযোগ। বসিরহাট থেকে দানসা নদী সন্দেশখালিতে এসে রায়মঙ্গলে পড়েছে। রায়মঙ্গলের উত্তরাংশের নদী কালিন্দী লাট নং ১৬৩ বা পারগুমটিকে বেড় দিয়ে এসে মিশেছে। কালিন্দী বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার পশ্চিমপ্রান্তে আন্তর্জাতিক সীমারেখা বরাবর প্রবাহিত হয়ে সুন্দরবনে রায়মঙ্গলে পড়েছে। যমুনা নদীরই অপর একটি শাখা ইছামতী নাম নিয়ে বসিরহাট, টাকী, শ্রীপুর, দেবহাট্টার দিকে ঢুকে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। রায়মঙ্গলেরই একটি শাখা নদী ঝিল্লা। খুব লম্বা না হলেও বেশ প্রশস্ত। রায়মঙ্গল থেকে দক্ষিণে নেমে দাওরগাঙে মিশে দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটি শাখা পূর্বদিকে হরিণডাঙায় ও অপর শাখা পশ্চিমে এসে গোসাবায় পড়েছে। হাসনাবাদ থানার অধীন কতকগুলি জোয়ার লাগা শাখার মিলিত হয়ে জল দিয়েছে কলাগাছিয়া নদী। এই নদী সন্দেশখালির নিচে ঘটিহারা নদীর একটি মুখ হয়ে বড়কলাগাছিয়া নদী নামে রায়মঙ্গলে মিশেছে। আর মঠবাড়ি আবাদের পাশ দিয়ে ধেয়ে আসা বিদ্যানদীর শেষ প্রান্ত ছোটকলাগাছিয়া নাম নিয়ে বড় কলাগাছিয়াতে মিশেছে।

হাঁড়িয়াভাঙা বা হরিণভাঙা

হুগলী নদী থেকে উৎপত্তি। উত্তর ২৪ পরগনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর রায়মঙ্গলের পশ্চিম শাখায় মিশেছে। রায়মঙ্গলেব

পূর্বশাখা ও হরিণভাঙার মাঝের দ্বীপটি তালপট্টি আর দক্ষিণে গড়ে ওঠা নতুন দ্বীপটি দক্ষিণ তালপট্টি।

ইছামতী

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পূর্বভাগে প্রবাহিত ইছামতী গুরুত্বপূর্ণ নদী। মাথাভাঙার একটি শাখানদী ইছামতীর জন্ম নদীয়ার পাবাখালিতে হুগলি নদীর শাখা চূর্ণী থেকে কৃষ্ণগঞ্জের কাছে। পদ্মা থেকে কুমার, তার থেকে ভৈরব এবং ভৈরবের শাখা মাথাভাঙা কৃষ্ণগঞ্জের কাছে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পশ্চিমদিকে গেছে চূর্ণী ও পূর্বদিকে ইছামতী। কুমার ও ভৈরবের উৎস মুখ শুকিয়ে যাওয়ায় মাথাভাঙায়ও জলধারা হ্রাস পায়। বর্ষায় মাথাভাঙার জল বাড়লে উক্ত জল বাহিত হয় ইছামতীতে। যমুনা ও ঢিবি নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত সুন্দরবনে কদমতলীতে মিশে মালঞ্চ নাম নিয়ে সাগরে পড়ে। সাগরে পড়ার সময় গোসাবা ও রায়মঙ্গলে মিষ্টিজলের প্রবাহ বয়ে নিয়ে যায়। বনগাঁ মহকুমার দক্ষিণ সীমায় পৌঁছে ইছামতী পুনঃবিভক্ত হয়েছে দুইভাগে। প্রধান শাখা সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে গেছে। যাবার পথে হিঙ্গলগঞ্জ থেকে বাংলাদেশের কালীগঞ্জ পর্যন্ত নাম কালিন্দী এবং তার পরে হয়েছে রায়মঙ্গল। অপর শাখাটি আড়বেলিয়া, বসিরহাট, টাকী হয়ে পুনঃ ইছামতীর মূল শাখায় মিশেছে। ৩৭২ মিটার দৈর্ঘ্য নদীপথে ইছামতীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে বহু নদী। পশ্চিমবঙ্গের যমুনা, কোদালিয়া, মকর, চেতনা ও বাংলাদেশের নাওডাঙা, বেত্রবতী, কপোতাক্ষ প্রভৃতি। বনগাঁর মাঝ বরাবর প্রবাহিত ইছামতীর দু'ধারে অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের ধারে গড়ে উঠেচে গাঁড়াপোতা গ্রাম। চেতনার তীরে বাগদহ, গাড়ুলিয়া ও মুস্তাফাপুর গ্রাম। ইছামতীর মরা গাঙ বল্লি বিলের মধ্য দিয়ে খাল কেটে সোনাই নদীকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে ইছামতীর সঙ্গে। এখানেই গড়ে উঠেছে গোকুলপুর, বড়বাঁকড়া, বায়লানী, সাড়াপুল, স্বরূপনগর ইত্যাদি গ্রাম। ইছামতীর শাখানদীর একটি গৌড়েশ্বরী বরুণহাট গ্রামের কাছে এবং আরেকটি হাসনাবাদের কাছে কাটাখালি। বনগাঁ, বারাসাত, বসিরহাট অঞ্চলের জলনিকাশের প্রধান পথ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাত ইছামতী সংস্কারের জন্য অপেক্ষমান।

কালিন্দী

ইছামতী-কালিন্দী-বায়মঙ্গল একই নদী। এক এক জায়গায় এক এক নাম। জোয়ার ভাটার লবণাক্ত নদী। বসন্তপুরে যমুনার যে শাখাটি দক্ষিণে প্রবাহিত তাই কালিন্দী প্রতাপাদিত্যের সময় ছিল সাধারণ পলি। ১৮১৬ সালে খনন করে কলাগাছিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এরই একটি শাখা খুলনা ও ২৪ পরগনার আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়ে হাড়িয়াভাঙায় মিশে সাগরে পড়েছে।

মাথাভাঙা ও চূর্ণী

মাথাভাঙার উৎপত্তি পদ্মা-গঙ্গা থেকে। বাংলাদেশে যাবার পথে হাটগোয়ালিয়ার

কাছে দুই ভাগ হয়ে পূর্বদিকের শাখাটি কুমার নামে বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে এবং অপর শাখাটি নদীয়ার মাজদিয়ায় এসে পুনঃ দুই শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি ইছামতী এবং অন্যটি চূর্ণী। ইছামতী বনগাঁর দিকে প্রবাহিত আর চূর্ণী রানাঘাটে এসে পশ্চিমমুখি হয়ে চাকদহের কাছে গৌড়নগরে ভাগীরথীতে মিশেছে। চূর্ণীর অপর নাম কঙ্কনা। রাজাকৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীকে কঙ্কনাকারে নদীবেষ্টিত করা হয়েছিল। ভরা বর্ষায় গঙ্গার ঘোলাটে জলে পরিপূর্ণ থাকে রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' খ্যাত চূর্ণী নদী।

বিদ্যাধরী

জোয়ার ভাটার নদী বিদ্যাধরী। আদিতে ভাগীরথীর শাখা নদী। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ভাগীরথীর জলধারা দক্ষিণ-পূর্বমুখী হওয়ায় ভাগীরথীর মতো বিদ্যাধরীও সংকীর্ণ হতে শুরু করে। বর্তমানে নদীয়ার হরিণঘাটা যাবার পথে যমুনা নদীর থেকে বেরিয়ে ৭২ কি.মি. পথ অতিক্রমণের পথে হাবড়া, দেগঙ্গা, হাড়োয়া, বারুইপুর, ক্যানিং হয়ে আঠারোবাঁকির সঙ্গে মিশেছে। কুলটির কাছে বিদ্যাধরীর শাখানদী রায়মঙ্গলে পড়েছে। দেগঙ্গার পশ্চিমসীমা দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যাধরীতে জোয়ারের সময় সমুদ্রের লবণ জল প্রবেশ করায় লোনাগাঙ নামে পরিচিত। বিদ্যাধরীর আরেকটি শাখা বারাসাত, রাজারহাট, দেগঙ্গা, ভাঙর, ক্যানিং হয়ে মাতলায় পড়েছে। আর একটি শাখা প্রবাহিত হয়েছে হাসনাবাদের দিকে। ১৮৯৭ ও ১৯১০ সালে ভাঙর ও কেষ্টপুর খাল কাটা হলে বিদ্যাধরী দ্রুত মজে আসে ও গতিপথ হারাতে থাকে।

পিয়ালী

ভগীরথপুরের কাছে বিদ্যাধরী নদীর দক্ষিণ পূর্বমুখী প্রবাহ পথের নিচের দিকে। একদা জোয়ার-ভাটার নদী পিয়ালী দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী প্রবাহিত হয়ে ক্যানিংয়ের ১৫ মাইল দূরে মাতলায় পড়েছে। পিয়ালীর দুই মুখ দিয়েই জোয়ারভাটা খেলতো বলে অপর নাম দোয়ানিয়া। এই প্রক্রিয়ায় নদীগর্ভে পলি জমতে জমতে ক্রমে দু'পাশের বাঁধ উঁচু হয়ে ওঠে এবং জল নিষ্কমণ ক্ষমতা হ্রাসের কারণে একটা বেসিনে পরিণত হয়।

গোসাবা

রায়মঙ্গল ও মাতলার কয়েকটি মিলিত স্রোত গোসাবা নদী। মাতলার শাখা জয়নগর থানা এলাকায় পরিচিত কৈকালমারী নামে। আবার হাসনাবাদ থানা ঘুরে যুক্ত হয়েছে মাতলার সঙ্গে। গোসাবা সুন্দরবনের নেতাধোপানির সঙ্গেও যুক্ত। গোসাবা গ্রামেই গড়ে উঠেছে হ্যামিলটন সাহেবের প্রথম ভারতীয় সমবায়িক উপনিবেশ।

সাহেবখালি

খুলনা-আমবেড়িয়া গ্রামের কোল ঘেঁসে প্রবাহিত কালিন্দী নদী থেকে বেরিয়ে সাহেবখালি নদী মিলিত হয়েছে রায়মঙ্গলে।

সোনাই

যমুনার শাখা সোনাই চান্দুরিয়ার কাছে চব্বিশ পরগনায় ঢুকেছে। প্রথমে দক্ষিণ-পূর্বমুখী ও পরে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে বল্লিবিলে পড়েছে। ইছামতীর যেস্থলে সোনাই-র উৎপত্তি গত শতকে ওই স্থানে চড়া পড়ে যায়। বল্লিবিলের ভেতর দিয়ে খাল কেটে সোনাইকে মিশিয়ে দেওয়া হয় ইছামতীর সঙ্গে।

গোবরাখাল

হাসনাবাদ সন্নিহিত যমুনা থেকে বেরিয়ে গোবরাখাল সন্দেশখালির দক্ষিণে সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়ে বিদ্যাধরীর সঙ্গে মিলেছে।

ভৈরব

একদা প্রমত্ত, কিন্তু, বর্তমানে গতিহারা। পদ্মা থেকে উৎপত্তি লালগোলা ঘেঁসে ধীরে ধীরে সরে যায় আখিরিগঞ্জের কাছে মুর্শিদাবাদ-নদিয়া-করিমপুর হয়ে বাংলাদেশে গিয়ে মিশেছে মাথাভাঙা নদীর সঙ্গে। এরপর দক্ষিণপূর্ব দিকে পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া সন্নিহিত ভৈরব জলঙ্গী নামে খ্যাত।

পরশ

বৃহত্তর সুন্দরবন ও খুলনা জেলার অন্যতম নদী পরশের উৎপত্তি ভৈরব থেকে। দুর্গম সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে খাঁজকাটা করাতের মতো একটানা দক্ষিণে সাগরমুখে এগিয়ে গেছে। পরশের দুর্গম তীরে প্রতাপাদিত্য শিবসা দুর্গ ও কালিমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রসুলপুর নদী

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের রসুলপুর নদীর উৎপত্তি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন বরোজখাল হিসেবে। পটাশপুর, হিজলি, খেজুরিকে বামদিকে ও দরিয়াপুরকে ডানদিকে রেখে হুগলী নদীর মোহনায় মিশেছে। জোয়ার-ভাটার নদী। এর ক্ষয়িত বালিয়াড়ি সমুদ্র সংলগ্ন উপকুলভাগ গঠনে সক্রিয়।

বিদ্যা

সাহেবখালির কাছ থেকে বেরিয়ে গোসাবা, পিরখালি হয়ে মাতলায় পড়েছে বিদ্যা। বহু খাড়িখালের মাধ্যমে বিদ্যা নদী মাতলা, গোসাবা ইত্যাদি নদীর সঙ্গে যুক্ত। বিদ্যা, গোসাবা, মাতলা, ঝিল্লা, গোমর, বারওলা, হোগল নদীগুলি সুন্দরবনের অন্যতম ব্যপ্ত জলপথ।

মেঁশেলী নদী

সুন্দরবনের গহন অরণ্য মধ্যস্থিত আঁকাবাঁকা পথ ধরে সাগর অভিমুখে যাত্রা মেঁশেলী নদীর। খুব বড় না হলেও ছোটও নয়। চড়ায় দাঁড়িয়ে ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের বিভিন্ন প্রজাতি।

আঠারোবাঁকি

১৮টি বাঁকের কারণে লোকমুখে নদীটির নাম হয়েছে আঠারোবাঁকি। মল্লার হাটের

উদয়পুরের কাছে মধুমতী নদী থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে আলাইপুরের কাছে ভৈরবে মিশেছে। মাত্র দক্ষিণভাগ কিছুটা নাব্য।

চার.

সুন্দরবনের প্রধান নদীগুলি ব্যতিরিক্ত আছে আরোও অসংখ্য শাখানদী, উপনদী, খাঁড়ি, খাল বা প্রণালী এবং দ্বীপ। অতিসাধারণ মানুষ নদীকে 'গাঙ' বলে। গাঙের বাঁকে বাঁকে নদী হয় বড়। পঞ্চাশ বছর আগেও মাঝি-মাল্লারা নদীর দূরত্ব নির্দেশ করতো বাঁক হিসাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াত বা কর্মপ্রবাহ নির্ধারিত হতো গাঙের জোয়ার-ভাটা বা পূর্ণিমা-অমাবস্যার জোয়ারের টানের সঙ্গে সংগতি রেখে। ১০২টি দ্বীপমালার মধ্যে ৫৪টিতে লোকবসতি আছে। বাকিগুলিতে বন্যপ্রাণী ও ম্যানগ্রোভবৃক্ষের অরণ্য। প্রতিটি দ্বীপ লবণাক্ত নদী খাড়ি বেষ্টিত। নদী নালা শিরা-উপশিরার মতো মোহনায় আসতে আসতে দ্বীপগুলির সৃষ্টি করেছে, আবার একের সঙ্গে অপরের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। একই নদীর বিভিন্ন দ্বীপ এলাকায় বিভিন্ন নাম, আবার একই নাম বিভিন্ন দ্বীপ সংলগ্নতায়। নদী আপন বেগে বয়ে চলেছে সাগরের টানে। যেতে যেতে একূল ভাঙে, ওকূল গড়ে। এইতো নদীর লীলা।

পথচালার পাথেয় —

১. চব্বিশ পরগণা - কমল চৌধুরী - ১৯৯৯

২. কোরক - সুন্দরবন সংখ্যা - ২০০০

৩. শ্রীখণ্ড সুন্দরবন - দেবপ্রসাদ জানা (সম্পাদিত) - ২০০৫

৪. আলোর জন্য - এপ্রিল-জুন সংখ্যা - ২০০৫

৫. বাংলার নদনদী - দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - ২০০৭